বই মেলা, ভাষা আন্দোলন এবং দু'ই হুমায়ুন

শুজা রশীদ

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ঢোকা অবধি বই মেলা আমার জীবনের একটা বিশেষ অংশ হয়ে উঠেছিলো। যদিও প্রতি বছর মাত্র এক মাস তার আয়ু কিন্তু প্রস্তুতি পর্ব এবং মেলা পরবর্তি আনুষঙ্গিকতা ধরলে বেশ কয়েকটা মাস মেলার সুত্র ধরে কেটে যেত, বিশেষ করে লেখালেখিতে যাদের আগ্রহ আছে তাদের জন্য। দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থাকায় ঢাকার বই মেলায় উপস্থিত হবার সৌভাগ্য হয়নি বহুদিন, কিন্তু তার স্মৃতি আজও খুবই উজ্জ্বল। বাংলা একাডেমীর চত্বরে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট বড় বইয়ের স্টলগুলো হরেক রকমের বইতে ঝকমক করছে; জনতার ঢল নেমেছে চারদিকে; উৎসাহী ছেলেমেয়েদের ছুটাছুটি, বিখ্যাত লেখকদের অটোগ্রাফ নেবার জন্য দৌড়াদৌড়ি; প্রেমময় তরুণের দল বই টইয়ের তোয়াক্কা না করে মেলা চক্কর দিয়ে ফিরছে তরুণিদের পিছু ধাওয়া করে; সহস্র পায়ের ধাক্কায় চারদিকে ধুলি ধুসরিত; কখনো কখনো এমন অবস্থা হয় যে পা রাখার জায়গা থাকে না, বিশেষ করে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে। সব মিলিয়ে একটা মন মাতানো, হৃদয় ভরানো অনুভূতি। এক যুগ পরেও সেই অনুভূতির রেশ একটুও কমেনি।

বই মেলার প্রসঙ্গ তুলে বাংলা ভাষার সৈনিকদের কথা উল্লেখ না করাটা রীতিমত অপরাধ মনে করি। আমাদের ভাষা-যুদ্ধের ইতিহাস জানেন না এমন বাংলাদেশী থাকার কথা নয় তবুও খুব সংক্ষেপেঃ
১৯৫২ সালের ২৭ শে জানুয়ারি যখন পূর্ব পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন কট্টর কণ্ঠে ঘোষনা দিলেন যে তিনি পাকিস্থানে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে দেখার সমর্থক তখন থেকেই বলা যায় ভাষা আন্দোলনের এক নতুন দিগন্তের শুরু হয়। মৌলানা ভাষানির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ভাষা আন্দোলন কমিটি গঠন করা হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের শুরুতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রদীপ্ত নেতৃত্বে এবং আরো অনেক বিদ্যাপিঠের ছাত্রদের অংশগ্রহনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করবার বিরুদ্ধে আন্দোলন কাঠামো নেয়। ফেব্রুয়ারী মাসের একুশ তারিখে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ছাত্ররা সেই নিষেধ অমান্য করলে গুলি চালানো হয় এবং বেশ কয়েকজন ভাষা সৈনিক শহীদ হন। ফলস্বরুপ আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে ওঠে এবং অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৭ই মে পাকিস্থানের দ্বিতীয় মাতৃভাষা হিসাবে বাংলাকে নাগরিকভাবে স্বিকৃতি প্রদান করা হয়। অস্বীকার করবো না, ক্যাডেট কলেজ থেকে বেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বো এমন চিন্তা ভাবনা কখন করি নি, কিন্তু নানান ঘাটের পানি খেয়ে যখন ফলিত পদার্থে গিয়ে নোঙর গাড়ি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নেয়া গর্ব উদ্দীপ্ত ভুমিকার কথা জেনে নিজেকে ভাগ্যবানই মনে হয়েছে। বিশেষ করে বই মেলার মাসটা যেন আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এক গর্বোজ্জল বহ্নি শিখার মত। এরশাদ সাহেবের কল্যানে আমাদের শীক্ষা জীবন 'শেষ হইয়াও হয় না শেষ' করতে করতে পুরো আটখানা বছর পেরিয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান ছোট বড় অনুষ্ঠান, খুট খাট থেকে হুট হাট গোলমাল আর সকাল নেই দুপুর নেই অলস আড্ডায় সময় কাটানো – বেশ একটা ধরা বাধা একঘেয়ে নিয়ম হয়ে গিয়েছিলো যেন। তার মাঝে বই মেলা আসতো নিঃসন্দেহে নতুন ছন্দের বারতা নিয়ে।
লেখা লেখিতে ছোটবেলা থেকেই কিঞ্চিত আগ্রহ ছিলো। এক স্নেহময় চাচা-চাচীর বাসায় দু' বছর বাস করেছিলাম কিশোরে পদার্পণের ঠিক আগে। মাথার মধ্যে ভয়াবহ লেখার পরিকল্পনা ঘোরাঘুরি করে। চাচারা ভাড়া বাড়ীতে থাকেন। বাড়ীয়ালা মুসল্লী মানুষ, পাজামা পাঞ্জাবী এবং গোল টুপি ছাড়া কোথাও যান না তবে বদ স্বভাবের মধ্যে একটিই – বছর বছর বাড়ী ভাড়া বাড়ান। বাসায় সবার রুষ্টতা দেখে মনের মধ্যে নিশ্চয় ভয়ানক উষ্মতা উকি দিয়ে থাকবে কারন ঝট করেই একখানা ব্যাঙ্গাক্তমুলক ছড়া লিখে ফেললাম। সেই ছড়া বাড়ীওয়ালা কখন দেখেন নি কিন্তু বাসার সবাই পড়ে খুব আনন্দিত হয়েছিলো। তাদের ক্ষোভ খানিকটা সময়ের জন্য হলেও হাসিতে পরিণত হয়েছিলো। বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোক জানতে পারলে নির্ঘাত মুর্ছা যেতেন কারন তার নুরানী দাড়ি নিয়ে অনেক মন্দ কথা লিখেছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা থেকে একটি কথা পরিষ্কার বুঝেছিলাম, লেখকদেরকে সামাজিকভাবে সবাই বিশেষ গুরুত্ব নাও দিতে পারেন কিন্তু তার লেখা দিয়ে একজন লেখক পাঠককে দিতে পারেন নির্মল আনন্দ, কিছুটা সময়ের জন্য হলেও ভুলিয়ে দিতে পারেন তাদের দৈনন্দিন জীবনের শত ছোট বড় দুঃখ কষ্ট, ব্যথা বেদনার কথা। একই সাথে মানুষকে সুন্দর ও কল্যানের পথ দেখানোর চেষ্টা করবার সুযোগ ও তাদের আছে।
বাংলাদেশী সাহিত্য, ছায়াছবি এবং মোটের উপর সংস্কৃতি নিয়ে আলাপ তুললে যে মানুষটির কথা অবশ্যই চলে আসে তিনি হচ্ছেন – হুমায়ুন আহমেদ। তার সহজ স্বাচ্ছন্দ্য লেখা, কৌতুহলদীপক এবং কৌতুকদৃপ্ত গল্প, নাটক এবং ছায়াছবির মাধ্যমে তিনি জয় করে নিয়েছেন কোটি কোটি বাংলাদেশীর (বাংলা ভাষীর) মন। আমি ব্যাক্তিগতভাবে মনে করি তিনি বাংলাদেশীদেরকে টেনে এনেছেন গল্পের রাজত্বে, জোয়ার এনেছিলেন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। তার নন্দিত নরকে, শংখনীল কারাগার, বহুব্রীহি জাতীয় বই এবং নাটক শুধু যে তাকেই বিখ্যাত করেছে তাই নয়, তা বাংলাদেশের শিল্প এবং সংস্কৃতিকে করেছে উর্বর, মানুষকে করেছে সচেতন। আশী এবং নব্বইয়ের দশকে যেভাবে সবাইকে দেখেছি তার উপন্যাস এবং নাটক নিয়ে মেতে উঠতে তা ছিলো নিঃসন্দেহে ঈর্ষনীয়। একটি উন্নয়নশীল দেশে যেখানে বই কিনে পড়ার মত মানুষ

তুলনামুলকভাবে কম তার মাঝেই কিংবদন্তী হয়ে উঠেছিলেন তিনি তার অসম্ভব জনপ্রিয়তা দিয়ে। অনেককেই দেখেছি তারা হুমায়ুন আহমেদ ছাড়া আর কারো লেখা প্রায় ছুঁয়েই দেখতেন না।

তবে, হুমায়ুন আহমেদ আমার কাছে একজন লেখকই শুধু নন। প্রত্যক্ষ শিক্ষক না হলেও আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন কালে তিনি রসয়নের শিক্ষক ছিলেন। তার সাথে সরাসরি আমার একবারই কথা হয়েছিলো। আমাদের ফলিত পদার্থের শিক্ষক রাখাল চন্দ্র মজুমদারের সাথে কার্জন হলের মধ্যে হেটে কোথাও যাচ্ছিলাম হঠাত হুমায়ুন স্যারের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। মজুমদার স্যার আমার লেখার বাতিকের কথা জানতেন এবং সম্ভবত গর্বিত ছিলেন। তিনি ঝট করে হুমায়ুন স্যারকে থামিয়ে দিয়ে বল্লেন,"হুমায়ুন সাহেব, আমাদের ডিপার্টমেন্টের এই ছেলেটাও আপনার মত লেখে। দোয়া করবেন ওর জন্য"।
হুমায়ুন স্যার কথা বার্তায় খুব একটা পটু ছিলেন বলে মনে হলো না। তিনি সংক্ষেপে 'আচ্ছা' জাতীয় কিছু বলেছিলেন, আমরা বিদায় নিয়ে যে যার পথে চলে গিয়েছিলাম। এর মাস খানেক পরে এক গল্প প্রতিযোগীতায় স্যার বিচারক ছিলেন। আরো অনেকের সাথে আমিও সেই প্রতিযোগীতায় অংশ নেই। আমি কোন পুরষ্কার পাই নি। মনে বেশ ব্যাথা পেয়েছিলাম। কিন্তু সেসব দিন বহু আগেই গত হয়েছে। তার পরও বহুদিন তার লেখার ভক্ত ছিলাম, গোগ্রাসে তার অনেক বই পড়েছি, কয়েকটি একাধিকবার। আমার বেশ কয়েক জন প্রিয় লেখক আছেন। হুমায়ুন স্যার যে তাদের মধ্যে একজন সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।
এখানে তার একটা রম্য রচনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না, এটি মনে করে আমি আজও হাসি। বলা যায় তার এই লেখাটি আমাকেও পরবর্তিতে রম্য রচনা লিখতে আগ্রহী করে তোলে (আমার যায় যায় দিনে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি রম্য রচনা নিয়ে 'সুখে দুখে কানাডা' নামে একটি বই বেরিয়েছিলো ২০১১ র বই মেলায়)।
তিনি এক বাসায় বেড়াতে গেছেন। বাসার ছোট ছেলেটি পায়খানা করেছে, সে বেশ কয়েকবার সবাই কে সেটা জানাবার চেষ্টা করে যখন কারো মনযোগ আকর্ষন করতে ব্যর্থ হল, তখন পায়খানা নিয়েই হাজির হল ড্রয়িংরুমে – 'হাগা নিয়ে আলাম' তার স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষনা।
হুমায়ুন স্যার এখন ক্যান্সারের সাথে যুঝছেন। নিউ ইয়র্কে। সবাই কম বেশী জানেন। ইচ্ছা আছে তাকে আমার শ্রদ্ধার্ঘ জানাতে সেখানে একবার যাবো।আমাকে তিনি চিনবেন না , চেনার প্রয়োজন ও নেই। আমার তারুণ্য এবং যৌবনের অনেকগুলি বছর তার লেখা গল্প এবং নাটক ব্যাতিরেকে কখনই পরিপূর্ন হত না। তাকে শুধু ধন্যবাদ জানানোটাই যথেষ্ট নয়। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছে হয়, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

হুমায়ুন ফরিদী মারা গেলেন। আমার আরেকটি প্রিয় মানুষ। কখন সামনা সামনি দেখিনি কিংবা কথা বলিনি কিন্তু তার নাটক এবং ছায়াছবি দেখে যে আনন্দ পেয়েছি তার তুলনা হয় না। তার একটি নাটকের কথা আজও মনে পড়ে। নাটকটির নাম মনে নেই কিন্তু দৃশ্যটা মনে হলে আজও হাসি আটকানো কষ্ট হয়। হুমায়ুন ফরিদী গৃহ শিক্ষকের ভুমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তার বাথরুমে যাবার দরকার কিন্তু যেতে পারছেন না কারন বাড়ীওয়ালা তার সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ জুড়ে দিয়েছেন। ফারিদী কুচকিতে হাত দিয়ে মোচড়াচ্ছেন, তার যেতেই হবে, যখন তখন অবস্থা। হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে গিয়েছিলো। বাংলাদেশে অনেক ভালো ভালো, ভীষন প্রতিভাবান অভিনেতারা নানা সময়ে এসেছেন কিন্তু সেই সব প্রতিভাবানদের মধ্যে ফারিদী ছিলেন নিঃসন্দেহে প্রথম সারির, একেবারে উচুর দিকে। এমন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবমুর্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য অভিনয়! বাংলাদেশের নাট্য এবং চিত্র অঙ্গনে তিনি বহুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

দুই হুমায়ুনকেই আমার প্রান ঢালা ধন্যবাদ, আমাদের জীবন কে আনন্দময় করবার জন্য, আমাদের স্মৃতিকে সুখময় করবার জন্য। একইসাথে প্রানভরা কৃতজ্ঞতা জানাই ভাষা সৈনিকদেরকে, যারা তাদের ত্যাগের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষাকে এবং সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে দাঁড় করিয়েছেন। আমরা তাদের অবদান চিরকাল মনে রাখবো।